ধর্মবিশ্বাস, বিজ্ঞানবিশ্বাস ও এক চিল্‌তে ইতিহাস

প্রদীপ দেব

১

- এই বিশ্বব্রহ্মান্ড গাছপালা মানুষ পশুপাখি নদীর স্রোত গানের সুর সব সব কিছু সৃষ্টি করেছেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান ঈশ্বর। তাইতো কবি বলেছেন, সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি, খোদা তোমার মেহেরবানী।

- ঈশ্বরই যদি সবকিছু সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করলেন কে?

- ঈশ্বরই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। আগে তিনি নিজেকে বানিয়েছেন, তারপর অন্যান্য সবকিছু। একটার পর একটা ।

- ব্যাপারটা বুঝলাম না, সৃষ্টি না হয়ে সৃষ্টিকর্তা হলেন কীভাবে? তিনি কি সবসময়েই ছিলেন, মানে সবকিছু সৃষ্টির আগে থেকেই?

- হ্যাঁ, তাই তো বলছি।

- বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টির আগে তিনি কোথায় থাকতেন? কী করছিলেন?

- তিনি নরক বানাচ্ছিলেন - তোদের মত নাস্তিকদের থাকার ব্যবস্থা করতে করতে। যত্তসব। দুপাতা বিজ্ঞান পড়েই মনে করছিস সবকিছু জেনে বসে আছিস! আরে ব্যাটা - বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

এরকম অন্তঃসার শূন্য তর্কবিতর্কের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। উপাসনা ধর্ম সম্পর্কে কোন প্রশ্নে অবিশ্বাসের ছায়া দেখলেই উপাসনা ধর্মে বিশ্বাসীরা খুব রেগে যান। বিশ্বাসের মতো তাঁদের রাগটাও অযৌক্তিক। বিশ্বাসের ভিত্তি শক্ত না হলে রাগ দেখানোই আত্মরক্ষার সহজ উপায়। রাগ দেখানোর পদ্ধতিটি অবশ্য একেক জনের কাছে একেক রকম, ক্ষমতা ও সুযোগ ভেদে তা সম্পর্কচ্ছেদ থেকে শিরচ্ছেদ পর্যন্ত হতে পারে।

২

ধর্মবিশ্বাসের সাথে বিজ্ঞানবিশ্বাসের কোন মিল নেই। উপাসনা ধর্মের পুরোটাই বিশ্বাস নির্ভর। কোন ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা বা কার্যকারণের সাথে তার সম্পর্ক অতি সামান্য। ধর্মবিশ্বাসের বেশির ভাগই আরোপিত এবং জন্মসূত্রে পাওয়া। মানুষ যে পরিবারে জন্মায় - ভালো লাগুক না লাগুক - পারিবারিক ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য তাকে বাধ্য করা হয়। সেক্ষেত্রে যাচাই বাছাই করার কোন সুযোগই থাকে না। পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর ভিন্নতার কারণে ধর্মবিশ্বাসেরও পার্থক্য দেখা দেয়। সে কারণেই দেখা যায় মিশরের মুসলমান আর বাংলাদেশের মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস হুবহু এক নয়। সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণেও ধর্মবিশ্বাসে ভিন্নতা দেখা দেয়। সউদি আরবের শেখ আর সুদানের দরিদ্র মুসলমানের ধর্ম এক হলেও ধর্মবিশ্বাস ভিন্ন। শুধু তাই নয়, সমস্ত পরিকাঠামো এক থাকার পরেও মানুষে মানুষে ধর্মবিশ্বাসে ভিন্নতা দেখা দিতে পারে।

ধর্মবিশ্বাস পরীক্ষা করে দেখার কোন উপায় নেই। ধর্মগ্রন্থে যা লেখা আছে, যেভাবে লেখা আছে তাকেই পরম সত্য বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয় ধর্মপালনকারীদের। যখন সাধারণ চোখেই দেখা যায় যে ধর্মগ্রন্থে যা লেখা আছে তার সাথে বাস্তবের কোন মিল নেই - তখন নানারকম খোঁড়া যুক্তি ধার করে ধর্মগ্রন্থের লেখাগুলোর অন্যরকম একটা ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। তাইতো ধর্মবিশ্বাসীদের বিশ্বাস করতে হয় যে যীশুখ্রিস্টের কোন বায়োলজিক্যাল ফাদার নেই। যীশুকে ঈশ্বরের সন্তান বলা হয়ে থাকে, কিন্তু যে জৈব প্রক্রিয়ায় প্রাণীর জন্ম হয় - সেরকম কোন প্রক্রিয়া মাতা মেরি ও ঈশ্বরের মধ্যে ঘটেছে বলে বাইবেলে পরিষ্কার করে কিছু বলা নেই। এক্ষেত্রে নানারকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

ধর্মবিশ্বাস কথাটি যতটা প্রচলিত - বিজ্ঞানবিশ্বাস সে তুলনায় কম। কারণ বিজ্ঞানে শুধুমাত্র বিশ্বাস দিয়ে কিছু প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান পরীক্ষামূলক প্রমাণ ও কার্যকারণের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানে একটা তত্ত্বের সাথে অন্য তত্ত্বের মিল থাকতে হয়। বিজ্ঞান ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে ভিন্ন হয় না। যদি হয় তারও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ম্যাগনেটিক প্রোপার্টিজ বদলে যেতে পারে। তা ধনী দরিদ্র সাদা কালো যে কোন মানুষের পক্ষেই পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব। কিন্তু একটি ইঁদুর যেমন মাধ্যাকর্ষণ এড়াতে পারে না - তেমনি ভ্যাটিকানের পোপের পক্ষেও মাধ্যাকর্ষণ এড়ানো সম্ভব নয়। বিজ্ঞানে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা অবশ্যই জানেন যে মাধ্যাকর্ষণ বল সাধারণ অবস্থায় সব সময়েই কাজ করছে। ওটা নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলেই তাতে বিশ্বাস রাখা যায়। কিন্তু যদি কেউ দাবী করেন যে তিনি কোন প্রকার প্রতারণার সাহায্য না নিয়ে

অলৌকিক উপায়ে মাধ্যাকর্ষণ এড়িয়ে শূন্যে ভেসে থাকতে পারেন - তাতে বিশ্বাস রাখা যায় না। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসীদের সকলেই কোন না কোন ক্ষেত্রে অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন। বিজ্ঞানে অলৌকিক বলে কিছু নেই।

বিজ্ঞানের যে সব তত্ত্ব এখনো প্রমাণিত হয়নি - সেখানে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ কাজ করতে পারে। যেমন স্ট্রিং থিওরি - এখনো প্রমাণিত হয়নি। সেখানে তাই এখনো মতদ্বৈততা কাজ করছে। নিউক্লিয়ার থিওরিতে বিভিন্ন মডেলে মতভিন্নতা আছে। কিন্তু সেসব আছে মূল সত্য বের করে আনার উদ্দেশ্যেই। সত্য উদ্ঘাটনের জন্য ভিন্ন মতাবলম্বীরাও একসাথে কাজ করে যায় বিজ্ঞানে। ভুল মতবাদ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেন। স্টিফেন হকিং আর রজার পেনরোজের মধ্যে অনেক বছর ধরে বিতর্ক চলেছে ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন নিয়ে। শেষপর্যন্ত দেখা গেছে হকিং এর একটি ধারণা ভুল ছিলো। এ ভুল স্বীকার করে নিতে হকিং এর একটুও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসে এরকম হয়না। সেখানে অহংবোধ বড়বেশি। আর সে কারণেই ধর্মে ধর্মে বিভাজন এত বেশি। বিভাজনের কারণে হানাহানি অনেক বেশি।

বিজ্ঞানবিশ্বাসের সাথে ধর্মবিশ্বাসের আরেকটি প্রধান পার্থক্য হলো ধর্মবিশ্বাস একটা পর্যায়ে বড়বেশি হিংস্র। ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়তো করুণা করা হয়, কিন্তু সম্মান করা হয় না ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে। পৃথিবীতে ধর্মীয় হানাহানির কারণে যত মানুষ মারা গেছে - আর কোন কিছুতে সেরকম হয়নি। আর বিজ্ঞানবিশ্বাসীরা বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে কখনো হিংস্র হয়ে ওঠেনি। অনেকে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানকে দায়ী করতে পছন্দ করেন। কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে বোমা তৈরি করা হচ্ছে - সে একই পারমাণবিক তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর মানুষের দৈনন্দিন জ্বালানির চাহিদা মেটানো হচ্ছে, ক্যান্সারের চিকিৎসা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানের দোষ প্রচার করা হয় রাজনৈতিক স্বার্থে।

রাজনীতি দিয়ে বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি চেষ্টা পৃথিবীর সব দেশেই হয়। সেটা হয় ধর্মবিশ্বাসের দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থে। যেমন স্টেমসেল রিসার্চের ক্ষেত্রে আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশও অনেক ধরণের বিধিনিষেধ আরোপ করে বসে আছে। ফলে যে গবেষণা থেমে আছে তা নয়। কিন্তু যে গতিতে চলতে পারতো সে গতিতে তা চলছে পারছে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সবসময়েই পেছনে টেনে ধরে রেখেছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এবং এ সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণ হিসেবে সবসময়েই দেখা যায় এক ধরণের ধর্মবিশ্বাস কাজ করেছে। একটু পেছনের দিকের ইতিহাস খুঁজে দেখলেই দেখা যাবে - বিজ্ঞানকে কোন সময়েই সহজে মেনে নেয়নি ধর্মবিশ্বাসীরা।

৩

যে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতি ধর্মবিশ্বাসীদের দৃষ্টিভংগিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক ভাবে কী আবিষ্কৃত হলো তা না জেনেই বলে দেয়া হয় যে এটা ধর্মবিরুদ্ধ, শয়তানের কারসাজী, এটাতে খোদা নারাজ হবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং সবাই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করতে থাকে তখন ধর্মবিশ্বাসীরা হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলে যে এসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সবকিছুই ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে। ধর্মগ্রন্থের পাতায় পাতায় বিজ্ঞান। হুঁ হুঁ বাবা, ঐশ্বরিক গ্রন্থ হলো সকল বিজ্ঞানের উৎস!! আর তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় না-জায়েজ বিজ্ঞানকে ধর্ম-প্রচারে কাজে লাগানো। একটা উদাহরণ দিই - মাইক্রোফোন আবিষ্কারের পর ওটা ব্যবহার করে আজান দেয়াকে না-জায়েজ বলা হতো। (চট্টগ্রাম শহরের একটি মসজিদে মাইক ব্যবহারকে কেন্দ্র করে এই সেদিনও মুসল্লীদের মধ্যে মারপিট হয়েছে।) আর এখন? বাংলাদেশের প্রতিটি শহরের হাজারো মসজিদের মাইক কী দৈনিক কী পরিমাণ শব্দ দূষণ করে তা যদি কেউ গবেষণা করে প্রকাশ করে - তার জীবন সংশয় দেখা দিতে পারে। কম্পিউটারে ভাগ্যগণনায় আজকাল দারুণ লাভ হয়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায় একদম শুরুতে ধর্ম ও বিজ্ঞানে খুব একটা বিরোধ ছিলো না। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। উপাসনা ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে অনেক পরে। সৃষ্টিকর্তার ধারণাও তৈরি হয়েছে আরো অনেক পরে। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের বিরোধের স্বরূপটা এক পলক দেখার জন্য আমাদের একটু পেছন দিকে যেতে হবে। ইতিহাসের দিকে। অবশ্য প্রচলিত ইতিহাস আর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রচলিত ইতিহাস মূলত রাজনৈতিক ইতিহাস। রাজা বা শাসনকর্তার ইচ্ছামতো এ ইতিহাস রচিত হয়, বিকৃত হয়, সত্যি ঘটনা মুছে ফেলা হয় বা সাজানো ঘটনার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। তবে মিথ্যার একটি বড় দুর্বলতা হলো এটা সবকিছুর সাথে সমন্বিত অবস্থায় বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। সামান্য সমন্বয়হীনতার লেজ যখন বেরিয়ে পড়ে - সে লেজ ধরে টান দিলেই মিথ্যার আবরণ খসে পড়ে একসময়। সত্য ইতিহাস সেভাবেই বেরিয়ে আসে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লেখা হয় প্রকৃতিতে। একটি ফসিল কত বছরের পুরনো, বা এক খন্ড মাটি কী কী সভ্যতা ছুঁয়ে এসেছে তা বৈজ্ঞানিক উপায়েই নির্ণীত হয়। সেরকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই আজ জানা যায় - পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে - কত বছর আগে।

৪

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় পাওয়া নানারকম তথ্যপ্রমাণ থেকে দেখা যায় আধুনিক মানুষ বা হোমো সেপিয়ান্‌স এর আগের প্রজাতি হোমো ইরেক্‌টাসের সময় থেকেই পৃথিবীতে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ত্রিশ লক্ষ বছর থেকে দশ লক্ষ বছর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হোমো ইরেক্‌টাসের উদ্ভব ঘটেছিলো। চীনের বেইজিং এর কাছে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক গুহায় পাওয়া নিদর্শন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় - আজ থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে হোমো ইরেক্‌টাসরা প্রাকৃতিক আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার প্রযুক্তি অর্জন করেছিলো। আগুন যে সকল প্রযুক্তির একটি প্রধান উৎস তা পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে। আগুন জ্বালানো, আগুনকে প্রয়োজন মত কাজে লাগানো এবং প্রয়োজন শেষে আগুন নেভানোর পদ্ধতি মানুষের আয়ত্ত্বে আসার সাথে সাথে সভ্যতার বিরাট একটি ধাপ অতিক্রান্ত হলো। আগুনের শক্তিকে আবিষ্কার করতে গিয়ে মানুষ দেখেছে আগুনের বিধ্বংসী ক্ষমতাও। সেসব থেকে আগুনের প্রতি ভয়ও তৈরি হয়েছে। ভয় থেকে মানুষ আগুনকে দেবতা জ্ঞান করতে শুরু করেছে। সনাতন যুগের সব ধর্মেই আগুন এর ভূমিকা বিশাল।

প্রকৃতিতে বাতাসের শক্তি দেখেছে মানুষ, দেখেছে ঘূর্ণিঝড়। তারপর যখন কৃষিকাজ শুরু করেছে মানুষ - আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে - দেখেছে মাটি থেকে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হচ্ছে, সব কিছু মাটিতে মিশে যাচ্ছে এক সময়। পরবর্তীতে গ্রিক দার্শনিকরা যখন পদার্থের মূল উপাদান নির্ধারণ করতে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে - তখন প্রাথমিক যুগ থেকে বয়ে আসা এ ধারণা কাজে লেগেছে। তাদের মনে হয়েছে - আগুন, পানি, মাটি আর বাতাসই হলো মূল উপাদান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখতে দেখতে মানুষ প্রকৃতিকে ভয় করতে শিখেছে - এবং সে ভয়কে জয় করার জন্য সংগ্রাম করতে শিখেছে। দেখেছে প্রত্যেক কাজের পেছনে কারো না কারো হাত রয়েছে। প্রকৃতির অদৃশ্য হাতকে ঈশ্বর জ্ঞান করতে শিখেছে।

ঈশ্বরের ধারণা তৈরি হবার পর মানুষের পর্যবেক্ষণে নতুন একটি ধারা তৈরি হলো। সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করার জন্য সামাজিক নিয়ম কানুন তৈরি হলো। শুরু হলো সামাজিক শ্রেণীবিভাগ। নিজেদের মধ্যেই টিকে থাকার সংগ্রামে শারীরিক শক্তির সাথে বুদ্ধিমত্তাও যুক্ত হলো। যাঁরা বুড়ো হয়ে শারীরিক শক্তিতে পিছিয়ে পড়লেন - তাঁরা সমাজে নিজেদের আসন ঠিক রাখার জন্য শুরু করলেন ধর্মব্যাখ্যা। পরবর্তীতে এদের নিয়েই একটা শ্রেণী তৈরি হলো। সামাজিক ধর্মগুরু বা পুরোহিত শ্রেণী। এ পেশায় টিকে থাকার জন্য তাদের দরকার হলো গভীর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ।

সূর্যোদয় সূর্যাস্ত জোয়ার ভাটা ঋতু পরিবর্তন জলবায়ুর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে এসবের পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হলো। এদের হাত ধরেই ক্যালেন্ডার তৈরি হলো আজ থেকে প্রায় ২৮০০ বছর আগে। প্রতিষ্ঠিত হলো সময়ের হিসেব - বছর, মাস, দিন, ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ড। সংখ্যার ব্যবহার শুরু হলো। সংখ্যা লেখার চিহ্নও তৈরি হলো। শুরু হলো পৃথিবী কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা। যেহেতু এদের ব্যাখ্যার ভুল ধরার কেউ নেই- কোথাও কোন বিরোধ ঘটলো না। এদের এবং এদের উত্তরাধিকারীদের হাতেই রয়ে গেলো সামাজিক ক্ষমতা। আরো পরে যখন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো - রাজত্ব পরিচালনার ব্যাপার এলো - তখনো এই পুরোহিত শ্রেণীর দাপট ঠিকই থাকলো। কারণ রাজারা দেখলো পুরোহিতদের কাজে লাগাতে পারলে রাজত্ব করা সহজ হয়। কারণ যে মানুষ রাজাকে ভয় পায় না সেও প্রকৃতির অজানা রহস্যকে ভয় পায়। ততোদিনে এ প্রকৃতির নাম হয়ে গেছে ঈশ্বর। কিন্তু রাজাদের মন যুগিয়ে চলতে গিয়ে পুরোহিত শ্রেণীর সততায় কিছুটা ভন্ডামীও ঢুকে পড়েছে। নিজেদের অজান্তেই তারা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ও তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিজেদের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতে চাইলেন না। ফলে স্বাধীন গবেষক ও রাষ্ট্রক্ষমতার কাছাকাছি গবেষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হতে শুরু করলো। আস্তে আস্তে আলাদা হতে শুরু করলো বিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাস। পরবর্তীতে যখন পৃথিবী কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা ভুল প্রমাণিত হতে শুরু করলো পুরোহিতরা ভাবলো এতে তাদের আসন টলে যাবে। তাই তারা সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণার বিরোধীতা করলো। রাষ্ট্র পুরোহিতদের সমর্থন করলো। সে কথায় আসছি আর একটু পরের দিকে।

৫

টেক্সাসের হিউস্টন থেকে প্রকাশিত “এ ব্রিফ ইলাস্ট্রেটেড গাইড টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইসলাম”[1] নামে একটি বই আমার হাতে এসেছে। সেখানে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে বিজ্ঞানের সাথে কোরাণের কোন বিরোধ নেই। বিজ্ঞান যা কিছু আবিষ্কার করছে - তা কোরাণ থেকেই ধার করা। মানব ভ্রূণের দুটো তুলনা আছে এই বইতে। একটি তুলনা হলো জোঁকের সাথে, অন্যটি হলো দাঁতে চিবানো চুইংগামের সাথে। এগুলো দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে কোরাণে মানুষের জন্ম কীভাবে হয় তার সঠিক বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কোরাণে উল্লেখ আছে আলাখ্‌ ও মুদ্‌ঘাহ্‌র কথা। আলাখ্‌ মানে হতে পারে জোঁক, ঝুলন্ত বস্তু বা জমাট রক্ত। আর মুদ্‌ঘাহ্‌ মানে চিবানো বস্তু। মানব ভ্রূণের ছবির সাথে জোঁক ও চিবানো চুইংগামের ছবির তুলনা করা হয়েছ আমাদের বোঝাতে যে কোরাণ সবজান্তা!

সে যাই হোক, মানুষের শরীর সম্পর্কে প্রত্যেক ধর্মই খুব স্পর্শকাতর। সকল ধর্মই শরীরকে খুব গুরুত্ব দেয়। এতই গুরুত্ব দেয় যে ধর্মের এ বাড়াবাড়ির কারণে প্রথম দিকে মানুষের শরীর নিয়ে কোন গবেষণা করাই সম্ভব ছিলো না। মৃত মানুষের শরীর ব্যবচ্ছেদ করে দেখা ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাবে নিষেধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের দেহের প্রথম ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিলো আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে। গ্রিক ডাক্তার আল্কমেইয়ন গোপনে মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে শিরা ও ধমনীর পার্থক্য খুঁজে পান। আর শরীরের বিভিন্ন অংগপ্রত্যংগের মধ্যে স্নায়বিক সংযোগের ধারণাও আল্কমেইয়নই দেন। কিন্তু পরবর্তী ছয় শ বছর ধরে মানুষের এনাটমি নিয়ে আর কোন গবেষণা করা যায়নি ধর্মগুরুদের বাধার কারণে।

খ্রিস্টান ধর্মের উত্থান ঘটার পর এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটলো। খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা প্রচার করতে লাগলো যে মানুষের শরীর ঈশ্বর প্রদত্ত আত্না রাখার একটি খাঁচা ছাড়া আর কিছু নয়। এবং সে খাঁচা খুলে দেখার অধিকার মানুষের নেই। সেসময় ১২৯ সালে ক্লডিয়াস গ্যালেনের জন্ম। তুরস্কের একটি ধনী পরিবারে জন্ম নেয়ার কারণে গ্যালেনের পক্ষে মানুষের শরীর পর্যবেক্ষণ করার কিছুটা সুযোগ হয়েছিলো। চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্য গ্যালেন রোমে গিয়ে রোমান গ্ল্যাডিয়েটরদের রক্তাক্ত দেহ পর্যবেক্ষণ করলেন অনেকদিন ধরে। হৃদপিন্ডের কাজ, শিরা ও ধমনীর কাজ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি। কিন্তু মানুষ তখনো বিশ্বাস করে যে আত্মা থাকে শরীরের ভেতর। গ্ল্যাডিয়েটররা আহত হয়ে মারা যাবার সময় গ্যালেন দেখলেন যে তাজা টকটকে ঘনলাল রক্ত বেরিয়ে আসছে শরীর থেকে। গ্যালেন ভাবলেন এর নাম জীবন। মারা যাবার সময় এভাবেই জীবন বেরিয়ে যায়। আর বেঁচে থাকলে ধমনী ও শিরা দিয়ে রক্তের সাথে জীবন প্রবাহিত হয়। গ্যালেনের অনেক ধারণা পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হলেও তারজন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আরো তেরশ বছর। গ্যালেন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। তাঁর এ বিশ্বাসের কারণে তাঁর পর্যবেক্ষণও ছিলো কিছুটা ঈশ্বর কেন্দ্রিক।

বিজ্ঞানের অন্যান্য কিছু শাখা যখন ডানা মেলতে শুরু করেছে - তখনো মানুষের শরীরের রহস্য জানার জন্য কোন গবেষণাই করা যাচ্ছে না ধর্মগুরুদের নিষেধের কারণে। ক্লসিয়াস গ্যালেনের পর্যবেক্ষণকেই সত্য হিসেবে ধরে নিয়ে চললো ১৪৯০ সাল পর্যন্ত। ধর্মগুরুদের প্রবল আপত্তির মুখেও ইতালির পাদুয়াতে এনাটমিক্যাল থিয়েটার তৈরি হলো। এখানে এনাটমি নিয়ে কাজ করলেন লিওনার্দো দা ভিনচি, এন্ড্রিয়াস ভেসিলাস প্রমুখ। মানুষের শরীরের ওপর ধর্মের বাধা নিষেধ কিছুটা কমে এলেও একেবারে থেমে নেই। এখনো মানুষের শরীর নিয়ে নতুন গবেষণায় ধর্ম একটি প্রধান বাধা।

জন্মনিয়ন্ত্রণকে অনেক ধর্মেই ধর্মবিরুদ্ধ কাজ বলে ধরে প্রচার করা হয়। গোঁড়া ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা কোন ধরণের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার করাকে ধর্মবিরুদ্ধ মনে করে। ১৯৫৬ সালে জন্মবিরতিকরণ পিল উদ্ভাবনের পর ধর্মগুরুরা ক্ষেপে গেলেন। কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হয়নি। মেয়েদের জীবন অনেকভাবেই বদলে গেলো এরপর থেকে। সন্তানজন্মসংক্রান্ত নানারকম রোগের হাত থেকে বাঁচতে আরম্ভ করলেন মেয়েরা। কিন্তু কিছু কিছু ধর্মবিশ্বাস এখনো বিজ্ঞানের এ অবদানকে স্বীকার করে না।

গর্ভপাতকে ধর্ম প্রবল ভাবে বাধা দিয়ে আসছে। খুব দরকার না হলে শখের বশে কেউ গর্ভপাত করে না। কিন্তু কিছু কিছু ধর্মবিশ্বাসী মনে করেন - এটা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ। তাঁরা আবার এটাও বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করার ক্ষমতা কারো নেই। তাহলে গর্ভপাত যেহেতু হচ্ছে তা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয় কীভাবে! কিন্তু যুক্তির কথা তো ধর্ম শোনে না। টেস্টটিউব বেবিকেও ধর্মবিশ্বাসীরা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ মনে করেন। সে একই রকম অন্ধকারাচ্ছন্ন মানসিকতার কারণে স্টেমসেল রিসার্চ বাধাগ্রস্ত। অথচ সে গবেষণা থেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে আল্‌ঝেইমারের মত মারাত্মক ডি-এন-এ ঘটিত রোগ থেকে।

৬

বিবর্তনবাদকে কিছু কিছু ধর্মবিশ্বাসী মোটেই স্বীকার করেন না। ১৮৫৯ সালে ডারউইনের ‘দি অরিজিন অব স্পেসিস’ প্রকাশিত হবার পর পৃথিবীর ধর্মাকাশে একটি ঝড় বয়ে গেলো। সে ঝড় এখনো থামেনি। ধর্মবিশ্বাসীরা মানতেই চাচ্ছেন না যে মানুষ সরাসরি ঈশ্বরের হাতে কাদামাটি থেকে তৈরি নয়। আদম বা হাওয়ার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি বৈজ্ঞানিক গবেষণায়। মানুষ এসেছে অনেক অনেক বছরের প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। নানারকম আগ্রাসী বিতর্ক শুরু হয়ে গেলো, যা এখনো চলছে বিশ্বজুড়ে। এ প্রসংগে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন বন্যা আহমেদের “বিবর্তনের পথ ধরে” [2] । এখানে একটা জিনিস লক্ষ্যণীয় যে বিবর্তনের বিরুদ্ধে নানারকম ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচার করা হচ্ছে। একই সাথে অনেক গুলো মতবাদ তো সত্য হতে পারে না। তা ছাড়া চোখের সামনে যে বিবর্তন ঘটছে - তা চোখে দেখার পরেও ধর্মের দোহাই দিয়ে তা না মানার গোঁ ধরে থাকলে তাতে কার কী উপকার হবে বোধগম্য নয়।

ধর্মবিশ্বাসীরা বিবর্তনবাদকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে না পেরে - প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে এখন। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন নামে একধরণের ছদ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গেলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে ঈশ্বর ছাড়া এরকম অপূর্ব বুদ্ধিবৃত্তিক নির্বাচন আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যোগ্যতমকে খুঁজে নেয়ার দায়িত্ব ঈশ্বর নিজের হাতেই রেখে দিয়েছেন। ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন বা আইডি তত্ত্ব মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ ক্ষমতায় আসার পর। সহজেই বোঝা যায় যে এটা একটা সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক চাল। আমি বেশ কয়েকজন গোঁড়া খ্রিস্টান বাইবেল বোদ্ধাকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি - বাইবেলে আইডি সম্পর্কে কী লেখা আছে বা আদৌ কিছু আছে কিনা। ঈশ্বরই সব কিছু ডিজাইন করেছেন জাতীয় এলোমেলো কিছু কথাবার্তা ছাড়া সুনির্দিষ্ট কিছু তাঁরা জানাতে পারেন নি। আসলে তত্ত্বটা খুব বৈজ্ঞানিক করতে গিয়ে সহজপাচ্য করতে পারেনি। এ প্রসংগে অভিজিৎ রায়ের একটি চমৎকার প্রবন্ধ আছে মুক্তমনায়, "আই ডি নিয়ে কূটকচালী" । আরো একটি চমৎকার বই এর নাম এখানে করা যায়। তা হলো রবিন উইলিয়াম্‌স এর "আনইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন, হোয়াই গড ইজন্‌ট এজ স্মার্ট এজ শি থিঙ্কস শি ইজ" [3]।

বিবর্তন প্রশ্নেই ধর্মবিশ্বাসীদের সাথে অনেকদিন থেকেই বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব চলছে পৃথিবীর সৃষ্টি ও বয়স নিয়ে। বাইবেলের পক্ষ নিয়ে একপক্ষ বলছে পৃথিবীর বয়স মাত্র ছয় হাজার বছর। অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ অনুসন্ধান, গবেষণা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে হিসেব করে দেখিয়েছেন যে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে কমপক্ষে সাড়ে চার শ কোটি বছর আগে। বাইবেলে বলা আছে বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টি হয়েছে মাত্র ছয়দিনে। ১৬৪২ সালে ব্রিটিশ মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ জন লাইটফুট "অবজারভেশন্‌স অন জেনেসিস" নামে ২০ পৃষ্ঠার একটি বই লেখেন। সেখানে তিনি লেখেন যে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৩৯২৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। আর মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে এর পাঁচদিন পর, ১৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল নয়টায়। ডক্টর লাইটফুট উচচশিক্ষিত মানুষ, কিছুদিন পর ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এর পর ১৬৫০ সালে এংলিকান বিশপ জেম্‌স উশার ওল্‌ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা অ দেবতাদের বয়স হিসেব করে ঘোষণা করলেন, পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে যীশুখ্রিস্টের জন্মের ৪০০৪ বছর আগে, অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখ রবিবার সকাল নয়টায়। সময়টি কোন্‌ দেশের স্থানীয় সময় তা জানা যায় নি। এঁদের এসমস্ত দাবীর সাথে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণের কোন মিল নেই। বৈজ্ঞানিক হিসেবে দেখা যাচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে প্রায় সাড়ে চার শ কোটি বছর আগে। যেহেতু ধর্মগ্রন্থগুলো এসব বৈজ্ঞানিক তথ্য এখনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেনি, ধর্মবিশ্বাসীরা এখনো বিশ্বাস করে পৃথিবীর বয়স মাত্র চার হাজার বছর। আর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ গুলো ঈশ্বরই ওভাবে রেখে দিয়েছেন মানুষের

জ্ঞানের সীমানা দেখার জন্য। কারণ তিনি মানুষের জ্ঞান পরীক্ষা করে দেখতে খুব পছন্দ করেন। এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছে এখনো, হয়তো চলবে অনেকদিন। তবে একসময় দেখা যাবে নতুন করে লেখা হচ্ছে বাইবেলের জেনেসিস - সেখানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রবেশ করানো হবে, এবং আবারো প্রচার করা হবে যা সব লেখা আছে বাইবেলে!!

৭

পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে - এ সত্য কখনোই মেনে নিতে চায়নি ধর্মবিশ্বাসীরা। কারণ মানুষকে ক্ষমতার কেন্দ্রে দেখতে ভালোবাসে সবাই। আর মানুষের পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরবে আর সবকিছু - পৃথিবী স্থির থাকবে - এরকমই বিশ্বাস ছিলো তখন। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ সালে গ্রিক দার্শনিক হিপার্‌কাস ধারণা দেন যে বিশ্বব্রহ্মান্ডের কেন্দ্রে আছে পৃথিবী। এর প্রায় আড়াইশ বছর পর টলেমি হিপার্‌কাসের তত্ত্ব সমর্থন করে নানারকম যুক্তি দেন। তাঁর একটি যুক্তি ছিলো, যেহেতু পৃথিবীতে মানুষ বাস করে - সেহেতু সবকিছু পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই ঘুরবে। চার্চের খুব ভালো লাগলো টলেমির কথা। ভালো লাগাই কাল হলো - মহাকাশ গবেষণা ভুল পথে এগোতে থাকলো পরবর্তী প্রায় সাড়ে তের শ বছর ধরে।

১৫০৭ সালে পোলান্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস দেখলেন টলেমির গাণিতিক যুক্তিগুলো প্রচুর ভুলে ভরা। কোপার্নিকাস হিসেব করে দেখালেন যে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। চার্চের রোষানলে পড়ার ভয়ে তিনি অনেক বছর এসব গবেষণা প্রকাশ করেননি। শেষে ১৫৪৩ সালে তিনি এ তথ্য প্রকাশ করেন “অন দি রিভিলিউশান অব দি হেভেনলি বডিজ” বইতে। তিনি জানতেন যে বইটি প্রকাশিত হলে চার্চের নেতারা ক্ষেপে যাবেন। বুদ্ধি করে কিছুটা ঘুষ দেয়ার মতোই তিনি বইটি উৎসর্গ করলেন পোপ তৃতীয় জন পল্‌কে। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হলো না। চার্চের নেতারা কোপার্নিকাসের বইগুলো পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিলেন। তবুও ভালো যে কোপারনিকাস্‌কেই পুড়িয়ে মারার আদেশ দেয়া হয়নি। পরে গ্যালিলিও যখন এ নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন - ক্যাথলিক চার্চ আদেশ দিলো কাজ বন্ধ করতে। গ্যালিলিওকে হুমকি দেয়া হলো যেন তিনি পৃথিবীর ঘূর্ণন সম্পর্কে আর একটি কথাও না বলেন। কিন্তু সহজে থেমে থাকার পাত্র গ্যালিলিও নন। তিনি একটি বই লিখলেন এবং তাতে পোপের বিরুদ্ধেও লিখলেন অনেক কিছু। ক্ষেপে গেলেন পোপ। গ্যালিলিওর সামাজিক প্রতিষ্ঠার কারণে তাঁকে হত্যা করলে জনমত চার্চের বিরুদ্ধে যেতে পারে ভেবে গ্যালিলিওকে গৃহবন্দী করা হলো। দীর্ঘদিন বন্দী অবস্থার মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে গ্যালিলিও

একসময় বাধ্য হয়ে ঘোষণা করেন যে, তিনি ভুল বলেছেন। কিন্তু সংগে সংগে এটাও বলেন যে, পৃথিবীর ঘূর্ণন কিন্তু পোপের কথামতো থেমে যাবে না। থেমে যায়নি। এতবছর পরে ভ্যাটিকানের পোপ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে গ্যালিলিওর প্রতি অবিচার করা হয়েছিলো সেদিন। ১৬০০ সালে নুহ্'র প্লাবন কখনোই হয়নি বলার অপরাধে ব্রুনোকে রোমের রাস্তায় প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মেরেছে ইউনাইটেড চার্চের যাজকেরা। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অ মতামতের কাছে ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছিলো চার্চ। তখন চার্চের শক্তি সংহত করার উদ্দ্যেশ্যেই ব্রুনোর মতো মানুষকে খুন করা হলো। ভিন্ন মতের বিরুদ্ধে ধর্মবিশ্বাসীদের এ হলো স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

৮

শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করলেই যে চার্চ ক্ষেপে যেতো তা নয়। মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমুলক আচরণ কোন ধরণের কারণ ছাড়াই ঘটেছে তখন। মিশরের হাইপাশিয়া ছিলেন ৩৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪১৫ সাল পর্যন্ত একমাত্র মেয়ে যিনি সমতল জ্যামিতিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি টলেমির পৃথিবী কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণাকেও স্বীকার করতেন। কিন্তু তারপরও তাঁকে প্রকাশ্যে হত্যা করেছে। রাস্তা থেকে টেনে চার্চের ভেতর নিয়ে গিয়ে হিংস্রভাবে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে তাকে। তারপর রাস্তার উপর পুড়িয়ে মেরেছে তথাকথিত প্রেমের অবতার যীশুখ্রিস্টের মতাদর্শে বিশ্বাসীরা। পরবর্তী এক হাজার বছরে আর একজন মহিলাও বিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে আসতে পারেন নি।

৯

বিজ্ঞান ও ধর্মের ইতিহাস অনেক দ্বন্দ্বে ভরা। অনেক সময় নিজেদের ব্যক্তিগত ঘৃণার বহিঃপ্রকাশও ঘটায় অনেকে। যেমন প্রথম জীবনে আইনস্টাইনকেও ইহুদি পরিবারে জন্ম নেয়ার কারণে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাঁর গবেষণাকে জার্মানিতে ইহুদিদের বিজ্ঞান নামে প্রচার করা হয়েছে। এখনো অনেক দেশে শুধুমাত্র ধর্মীয় সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রতিনিধি হবার কারণে বৈষম্যের শিকার হতে হয় বিজ্ঞানীদের। বিজ্ঞানের কথা বললে তা যদি ধর্মের বিরুদ্ধে যায় - তা ব্যক্তিগত মত বলে প্রচার করা হয়। কিন্তু সুখের কথা হলো - বিজ্ঞানকে অস্বীকার করলেই তা মিথ্যা হয়ে যায় না।

বর্তমানে সব ধর্মবিশ্বাসীরাই প্রমাণ করতে চাচ্ছে তাদের ধর্ম বিজ্ঞান সম্মত - তাতে বিজ্ঞানের শক্তিকেই স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে। কারণ বিজ্ঞান চলবে বৈজ্ঞানিক ধর্মের ভিত্তিতে, কিন্তু বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অচিরেই অচল হয়ে যাবে।

---

[1] Ibrahim, IA. A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam. Houston: Darussalam. 1997.

[2] বিবর্তনের পথ ধরে; বন্যা আহমেদ; ফেব্রুয়ারি ২০০৭; অবসর, ঢাকা;

[3] Williams, R. Unintelligent Design Why God Isn't As Smart As She Thinks She Is. New South Wales, Australia: Allen & Unwin. 2006.

ড. প্রদীপ দেব অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। ইমেইল - Pradip.Deb@utas.edu.au. প্রকাশিত বইঃ অস্ট্রেলিয়ার পথে পথে (২০০৫), আলবুকারকি থেকে হলিউড (২০০৬), আইনস্টাইনের কাল (২০০৬)।